দারোগা যখন গোয়েন্দা

১

মূল কাহিনি

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্র বসু

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সরলীকৃতপাঠ ও সম্পাদনায়

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

ভূমিকা

লেখা নানান ধরনের হয়। কিছু লেখার মধ্যে পারিপার্শকি ঘটনাবলি সরাসরি দেখা যায় না। আবার কিছু লেখার মধ্যে দেশ কালের নানা রকম ছবি ধরা পরে। সেই সঙ্গে লেখকের চিন্তাধারার মিশেল ঘটে লেখাটিকে একটা আলাদা মাত্রা দেয়।

লেখকের চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে ঘটনাবলি যখন পাঠকের চোখের সামনে হেঁটে চলে বেড়ায়, তখনই সেই লেখা পাঠকের মনে রসের সঞ্চার করে। ঐ লেখা স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের মনে ধরে যায়। সচেতন পাঠক আবার লেখার মধ্যে দিয়ে রচনাকালকে জানতে বা বুঝতে চান। লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকের সেই জানার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্বও থাকে লেখকের ওপর।

আমাদের দেশে লেখা অনেকরকম রয়েছে। কিন্তু আগেকার দিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে এদেশে খুব বেশি লেখা হয়নি। আজকের দিনে পুরানো দিনের লোকজনেরাও তাঁদের যুবক বয়সের ঘটনাই মনে করতে পারেন না, লিখে রাখা তো দুরের ব্যাপার। এই বইতে ব্রিটিশ শাসনকালে গোয়েন্দা পুলিশের নানারকম ঘটনার কথা গল্পের আকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ আমল থেকেই পুলিশের গঠন শুরু হয়। প্রধানত আইন কানুন সমাজে বজায় রাখার কারণেই পুলিস ডিপার্টমেন্টের উৎপত্তি। নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই পুলিশ তার আজকের চেহারা লাভ করেছে।

কিন্তু সেই আমলের পুলিশের ঘটনাবলি লিখে রাখার কোনোরকম চেষ্টাই আজ অবধি তেমন ভাবে করা হয়নি। কয়েক জন দারোগার জীবনের কিছু তদন্তের কথা বিক্ষিপ্ত ভাবে লেখা হয়েছে, কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। সেসব লেখা আবার খুব একটা সহজলভ্যও নয়।

"দারোগা যখন গোয়েন্দা" সে যুগের কয়েকটি ঘটনার সমষ্টি। এই বইয়ের লেখাগুলি পড়ে পাঠক সে সময়ের একটা ধারণা পাবেন। এই বই কেবলমাত্র পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য নয়। সেই আমলের পুলিশের কাজের ধরন-ধারণ সম্পর্কে একটা ধারণা এই বইতই থেকে পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র চোর ধরার

কাহিনী নয়, পুলিশের প্রথম যুগের গোয়েন্দাদের কাজের প্রণালি বুঝতে সাহায্য করবে এই গল্পগুলি।

এই বইয়ের ঘটনাবলি প্রধানত উনিশ শতকের ছয়ের দশকের। সেই সময়টা ছিল খুবই অস্থির। খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর পরিবর্তন ঘটছে। সে সময় গ্রাম বাংলায় নিয়মিত ডাকাতি হত। ব্রিটিশ আমলে জমিদারের পুলিশ আর সরকারি পুলিশ আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করত। ফলে অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিত।

লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলেই প্রথম থানাগুলোর এলাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর 'থানাদার' পদটি উঠিয়ে দিয়ে 'দারোগা' পদটি তৈরি করা হয়। গ্রামের চৌকিদারদের রাখা হল সেই দারোগাদের অধীনে। তারপর দারোগাদের কাজের পদ্ধতিও বদলে গেল কালের নিয়মে। আজকের গোয়েন্দা পুলিশের জন্মের অনেক বছর আগেই।

তখনও পর্যন্ত পুলিশের উঁচু পদে সাহেবদেরই রাখা হত। লেখাপড়া জানা উঁচু বংশের ভারতীয় যুবকদের তখনও পর্যন্ত সেভাবে পুলিশের কাজে দেখা যেত না। এই কারণেই হয়ত ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার কথা আজ অবধি খুব বেশি পাওয়া যায়নি। তাই ধরেই নেওয়া যায় যে শিক্ষিত যুবকেরা সে সময় দারোগার চাকরিতে তেমন উৎসাহ দেখাত না।

তবে পরবর্তী সময়ে অবস্থাটা একটু বদলে গেল। লেখাপড়া জানা যুবকেরা পুলিশের চাকরিতে আগ্রহ দেখাতে শুরু করল। তাই সেসব দারোগাদের অপরাধী ধরার ধরনটাও একটু অন্যও রকম হতে থাকল। আসলে অপরাধের বদলে যাওয়া ধরন ধারণ পুলিশের কাজেও একটা বিবর্তন আনল বলা যায়।

এই বইয়ের সমস্ত ঘটনাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক।কিন্তু এগুলোকে ঠিক সেই অর্থে স্মৃতি কথা বলা যায় না। ঘটনাগুলো রোমাঞ্চকর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ঘটনাগুলি থেকে সচেতন পাঠক তাঁদের ভাবনার রসদ পাবেন নিশ্চয়ই। দারোগাদের অপরাধী ধরার পদ্ধতি, কিম্বা তাঁদের সাহসিকতা পাঠককে গল্পের শেষ অবধি আটকে রাখবেই।

"দারোগা যখন গোয়েন্দা" কয়েকটি গল্পের সমষ্টি হলেও এর কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়। যদিও গল্পের খাতিরে চরিত্রগুলির নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘটনাগুলিও বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর। লেখার ভাষাও যথা সম্ভব আধুনিক করা হয়েছে পাঠকের বোঝার কারণে।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নথি জালিয়াতি রহস্য ১১
চোর বনাম দারোগার টক্কর ২২
হারানী ৩১
হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস ৩৯

গিরিশচন্দ্র বসু

মনোহর ঘোষ ৫৯
চোরের আবদার ৭৫
সাহেব চোরের কিসসা ৮৭

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

অপরাধী ডাক্তারবাবু ৯৫

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

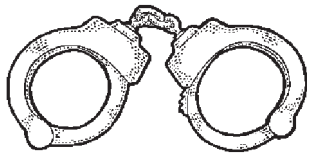

নথি জালিয়াতি রহস্য

লস্করপুরের নবকুমার দত্ত নগদ তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁর আবাদি জমি বিক্রি করে দিলেন গাংপুরের গণপতিবাবুকে। যদিও চাষ-আবাদ করাই ছিল তাঁর মূল জীবিকা। কিন্তু মেজভাই রামকুমারের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি টাকা সেবার খরচ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বেশ কিছু ধারদেনাও হয় নবকুমারের। সেই ধার শোধ করার জন্যই এই জমি বিক্রি করা।

তখন ফসল কাটার সময়। গণপতি ফসল কাটার জন্য লোকজনসহ যন্ত্রপাতি জমিতে পাঠান। কিন্তু হঠাৎ নবকুমারের লোকজনেরা তাদের বাধা দেয়। ফলে, পুরোদস্তুর দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। এমনকী, খুন-জখম পর্যন্ত বাকি রইল না। অগত্যা গণপতি জমির দখল পাবার জন্য আদালতে মামলা করলেন। নবকুমারও যথাসাধ্য লড়তে লাগলেন। নিম্ন আদালত গণপতির পক্ষে রায় দিলেন। সেই সঙ্গে পুলিশকেও নির্দেশ দিলেন যাতে জমির স্বত্ত্বাধিকারীর স্বার্থ রক্ষা হয় তা নিশ্চিত করতে। মামলার খরচের দায়ে নবকুমারের ভিটেমাটি পর্যন্ত বন্ধক দিতে হল।

এরপর একদিন ফসল কাটার সময় থানার দারোগা তাঁর পেয়াদা ও আদালতের মুখ্য কেরানিসহ ঐ জমিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পাহারা থাকায় গণপতির লোকেরা নির্ভয়ে ফসল কাটার কাজ শুরু করে দিল। ওদিকে লোক মারফত নবকুমারের কাছে খবর গেল।

নবকুমার বছরের কিছুটা সময় পাশের গ্রামের জমিদারের সেরেস্তায় চাকরি করত। জমিতে ফসল কাটার সময় সে বাড়িতে আসত। আবার ফসল তোলা হয়ে গেলে সে সেরেস্তার চাকরিতে যোগ দিত। ভাগ্যক্রমে এই সময়টায় সে

বাড়িতেই ছিল। সে যথারীতি তার লোকজন নিয়ে জমিতে হাজির হল।

গিয়েই দারোগার কাছে হাতজোড় করে কেঁদে ফেলল, "হুজুর, আমায় রক্ষা করুন। ধর্মাবতার এসব ঝগড়াঝাটির কথা নয়। খোদ আইনের কথা। স্বয়ং জজসাহেবের হুকুম। এ তো অমান্য করার নয়। তিনিই তো হুকুম দিয়েছেন যে বাদীর আবেদন খারিজ। আর প্রতিবাদীর জমিজমা তারই জিম্মায় থাকবে।"

আদালতের সিলমোহরসহ রায়ের কপি নবকুমার দেখাল আদালতের লোককে। তাঁর তো মাথায় হাত। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে। কেরানিবাবু বেশ বুঝতে পারলেন। কিন্তু হুজুরের রায়, তা আবার সিলমোহর দেওয়া। অমান্য করার কোনও জায়গাই নেই। এমনকী সেই কপিতে এও লেখা আছে যে দ্বিতীয় হুকুম জারি না করা পর্যন্ত জমির ফসল কাটা বন্ধ থাকবে।

নিরুপায় দারোগা সেই মতো মৌখিক আদেশ দিয়ে পেয়াদা নিয়ে ফিরে গেলেন। গণপতিবাবু অগত্যা আদালতে ফের আপিল করলেন। জজসাহেব তাঁর রায়ের আসল কপি বের করে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। সবার সামনেই তিনি বলে ফেললেন, "আমার বেশ মনে আছে গণপতিকেই আমি ডিক্রি দিয়েছি। কিন্তু নথিতে এ কী লেখা? এ যে একেবারে উলটো কথা লেখা!"

জজসাহেবের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গোটা আদালতময় রাষ্ট্র হয়ে গেল সেই ভীষণ জালিয়াতির কথা। গোটা রায়ের কপিটাই জাল। আদালতের সকলেই তটস্থ। এই ভীষণ জালিয়াতির দায়ভার কার ঘাড়ে পড়বে আর কে-ই বা জন্মের মতো জেলে যাবে, এই কথা ভেবেই সবাই ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ঠিক জজসাহেবের হাতের লেখার মতন অক্ষর, যেমন সই হুবহু সেইরকম। সিলমোহরটাও একদম আসল। জজসাহেব নিজেও কিছু ভেবে পেলেন না। লেখা, সই, সিল সব কিছু দেখে নকল বলার সাহস কারোর হবে না। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা লিখে উচ্চ আদালতে পাঠিয়ে দিলেন।

কেউই যখন নথি জাল বলতে পারল না তখন সেই নথিকে নাকচই বা কে করবে? নথি যদি জাল হয়, তাহলে তো জালিয়াতকে ধরতে হয়। নবকুমারের বিরুদ্ধে একটিও সাক্ষী পাওয়া গেল না।

আইনানুসারে এক্ষেত্রে পুনর্বিচারও হয় না। অনন্যোপায় হয়ে উচ্চ আদালতের জজসাহেব আদেশ দিলেন যে বাদী নিম্ন আদালতে পুনর্বিচার চাইলে আদালত আবার এই মামলায় অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজেরও বিশ্বাস হল না। নিম্ন আদালতের

গিরিশচন্দ্র বসু

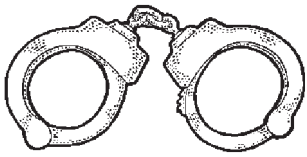

মনোহর ঘোষ

সে বছর পুজোর মাসদুয়েক আগেই আনোয়ার হোসেন মুস্তাফি নামে একটি অল্পবয়েসি ছেলে নবদ্বীপ থানায় দারোগা হয়ে এল। নবদ্বীপে মুস্তাফির যে ক'জন জানাশোনা লোক ছিল তারা কেউই এতে খুশি হল না। তারা বরং একটু দুঃখিত হয়েই তাকে বলল যে সে খুব খারাপ সময়ই দারোগা হয়ে এখানে এসেছে। কারণ সামনেই পুজো। গত কয়েকবছর এই সময়েই চুরিচামারি এখানে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এবছরও নিশ্চয়ই সেরকম আশঙ্কা আছে বলেই সরকার বাহাদুর মুস্তাফির মতো তরুণ, সৎ, নির্ভীক ছেলেকে এখানে দারোগা হিসেবে পাঠিয়েছে।

থানার অন্যান্য লোকেরাও যারপরনাই আশঙ্কিত হয়ে পড়ল। কারণ মুস্তাফি একে নতুন দারোগা, তার উপর এই এলাকায় কে চোর আর কে সাধু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাজেই এমন কঠিন সময় এইরকম একজন নতুন দারোগার পক্ষে এলাকায় অপরাধ কমিয়ে শান্তি বজায় রাখাটা অসাধ্য না হলেও কিন্তু বেশ কঠিন।

থানার বড়বাবু আগেই মুস্তাফিকে জানিয়ে রাখলেন, "এই নবদ্বীপের মধ্যে চোর বদমায়েশ খুব বেশি নেই। কিন্তু আশপাশের গ্রাম থেকে অন্য লোকেরা এসে এখানে চুরি ডাকাতি করে। ওদের পক্ষে নবদ্বীপে ডাকাতি করার একটা বড় সুবিধে আছে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নবদ্বীপের তিনটে গ্রাম আছে পরানপুর, পূর্বস্থলী আর নবদ্বীপ। এই সব ক'টি গ্রামই কৃষ্ণনগর জেলার অধীনে। বাকি সব গ্রাম বর্ধমান জেলায় পড়ে। এবার নবদ্বীপের পুলিশকে যদি বর্ধমান

জেলার কোনও লোককে ধরতে হয়। তাহলেই সেই জেলার পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। তাতে সময় লাগে বেশি, ফলে চোর বদমায়েশরা অনেক সময় পেয়ে যায় সাবধান হবার বা পালিয়ে যাবার জন্য।"

মুস্তাফি তো এইসব ঘটনা শুনে একটু ভয়ই পেয়ে গেল। সে যদিও চৌকস দারোগা। এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ডিপার্টমেন্টে তার যথেষ্ট নামডাক হয়েছে। কিন্তু কী করে গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা আর নিজের চাকরি বজায় রাখবে সেটাই এখন তার সবথেকে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সৌভাগ্যক্রমে মুস্তাফির আর একটা সুবিধে ছিল। তার মামা কৃষ্ণনগর জেলায় একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মুস্তাফি এলাকার অপরাধীদের বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারল। তাছাড়া তাঁকে সাহায্য করার জন্য থানায় সে পেয়ে গেল রামকুমার চৌকিদারকে। সে পুরানো লোক। সৎ এবং বিশ্বাসী। তার কাছ থেকেও আরও অনেক খবর পাওয়া গেল।

মুস্তাফি তাঁর মামা ও রামকুমারের সঙ্গে কথা বলে বেশ বুঝতে পারল যে পাশের গ্রামে মনোহর ঘোষ নামে একটা লোক থাকে। তাকে ধরতে পারলেই এলাকার প্রায় নব্বই শতাংশ অপরাধের কিনারা করে ফেলা যাবে।

মুস্তাফি জানতে চাইল, "এই মনোহর কে? তার পরিচয়ই বা কী?"

রামকুমার জবাব দিলে, "আপনি যেমন পুলিশের দারোগা। মনোহর তেমনই চোর-ডাকাতদের দারোগা। কিন্তু তার নামে কেউ নালিশ করতে থানায় আসে না। কাজেই পুলিশেরও কিছু করার থাকে না।"

এরপর মুস্তাফি এলাকার সাধারণ লোকজনেরদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। সবার অভাব অভিযোগ শুনল। তাদের থেকে পরামর্শ নিল। ক্রমেই সে এলাকার লোকের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এতে করে মনোহরের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করাটা তার কাছে অনেক সহজ হয়ে গেল।

মনোহর ঘোষ জাতে গোয়ালা। তার বাড়ি পরাণপুর গ্রামে। বাড়িতে তার বাবা, মা, বউ আর একটি ছোট মেয়ে আছে। মনোহর ছিল অত্যন্ত বলশালী লোক। সে একা চার-পাঁচজনের মহরা নেবার ক্ষমতা রাখত। লাঠিখেলা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এসব কাজে সে বিশেষ পারদর্শী ছিল। একইসঙ্গে তার মাথার বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। অত্যন্ত বিপদের সময়েও সে এমন বুদ্ধির পরিচয় দিত তা দেখে সঙ্গীসাথীরাও তাকে নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

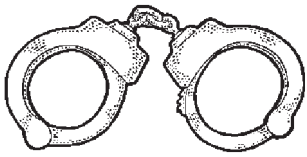

অপরাধী ডাক্তারবাবু

কলকাতার একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির বড় সাহেব একদিন একখানা বেনামি চিঠি পেলেন। চিঠির সারমর্ম এইরকম, "ডাক্তার দিবাকর সেনের ভাই শ্রী সুধাকর সেনের নামে ত্রিশ লাখ টাকার একটি জীবনবিমা আছে আপনাদের অফিসে। ডাক্তারবাবু ওই বিমার নমিনি হয়েছেন সম্প্রতি। এখন সুধাকর সেনের মৃত্যু হওয়ায় ওই বিমার টাকা আদায় করার জন্য ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের অফিসে যাবেন। কিন্তু তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান না করে বিমার টাকা দিয়ে দিলে আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ অনুসন্ধান করলেই বুঝতে পারবেন যে সুধাকর সেনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।"

বিমা কোম্পানি যথারীতি এই ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য পুলিশের সাহায্য চাইল। এমনকী তারা এ-ও ঘোষণা করে দিল যে যদি সঠিক কারণ বের করা যায় তাহলে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে পুরস্কৃত করা হবে।

তদন্তের ভার দেওয়া হল লাল বাজারের ডিসি ডিডি ২ প্রিয়নাথ মুখার্জির উপর। এতবড় নামী একজন ডাক্তারের অনুসন্ধান স্বভাবতই বেশ কঠিন কাজ। তাই অত্যন্ত গোপনে তদন্ত শুরু করলেন প্রিয়নাথ বাবু। নানারকম কৌশল অনুসরণ করে ডাক্তারের বাড়ির লোকজন, তার পরিবারবর্গের থেকে খবর সংগ্রহ করে অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। বিচারে ডাক্তারের ৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

যে সময়ে ডাক্তার সেন জেলে ছিলেন, সেসময়ে একদিন পুলিশ অফিসার প্রিয়নাথ মুখার্জিকে কোনও একটা কাজের সূত্রে সেখানে যেতে হয়েছিল।